بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, মানুষের জন্য দু'টো জিনিসের পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক, একটি হলো চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা আর অপরটি সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি এবং পুণ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবেগ অনুভূতির পরিচ্ছন্নতা। হৃদয়ের সাময়িক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষের সুগভীর আবেগ-অনুভূতি-সংক্রান্ত চেতনা বা সচেতনতা অর্জন হয় না। স্থায়ী, নিষ্কলুষ এবং পূত-পবিত্র আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয় হৃদয়ের পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার কল্যাণে অর্থাৎ চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা বা চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা সবসময় পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ থাকা। যাকে আরাবীতে বলা হয় 'তানভীর' আর তা মন-মস্তিষ্কের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার ফলে অর্জন হয়। 'তানভীর'-এর অর্থ হলো, মানুষের মাঝে এমন জ্যোতি সৃষ্টি হওয়া যার ফলে সদা পূত-পবিত্র এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা হৃদয়ে জন্মে। চেষ্টার মাধ্যমে পবিত্র চিন্তাধারা সৃষ্টি করাকে 'তানভীর' বলা হয় না বরং 'তানভীর' হলো, এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া যার ফলে মাথায় সবসময় সঠিক চিন্তাধারাই বিরাজ করে, কখনো ভ্রান্ত চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় না। আর এটি জানা কথা যে, এ বিষয়গুলো অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং খোদার কৃপার গুণেই সৃষ্টি হয়। যাহোক, এ প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন,

আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, কোন সময় যখন তাঁকে ইসলামী আইন বা ফিকাহ-সংক্রান্ত কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হতো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু এই বিষয়গুলো তাদের স্মরণ থাকে যারা সবসময় এমন কাজে রত থাকে তাই প্রায় সময় তিনি বলতেন, যাও মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস কর বা অনেক সময় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের নাম নিয়ে বলতেন, তাকে জিজ্ঞেস কর বা মৌলভী সৈয়্যদ আহসান সাহেবের নাম নিয়ে বলতেন, তাকে জিজ্ঞেস কর বা অন্য কোন মৌলভীর নাম নিতেন। আর কোন সময় যখন তিনি দেখতেন যে, এর সমাধান এমন কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে তাঁর জন্য পৃথিবীকে পথের দিশা দেয়া আবশ্যক, তখন তিনি স্বয়ং এর উত্তর দিতেন। কিন্তু কোন বিষয়ের সম্পর্ক যদি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে না থাকত তখন তিনি বলতেন, অমুক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস কর। আর মৌলভী সাহেব সেই বৈঠকে বা সভায় উপস্থিত থাকলে তাকে বলতেন, মৌলভী সাহেব! এই এ বিষয়ের সমাধান কি? কিন্তু অনেক সময় যখন তিনি বলতেন, অমুক মৌলভী সাহেবের কাছে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস কর তখন একই সাথে তিনি এটিও বলতেন, আমাদের ফিতরত বা প্রকৃতি অনুসারে এই বিষয়ের সমাধান এমন হওয়া উচিত। আবার এটিও বলতেন, আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান না থাকলেও আমাদের

ফিতরত বা মন থেকে এ সংক্রান্ত যে ধ্বনি উত্থিত হয় পরবর্তীতে হাদীস এবং সুন্নত থেকে সেই বিষয়টি ঠিক সেভাবেই প্রমাণিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ বিষয়কেই 'তানভীর' বলা হয়। 'তানভীর' হলো, মানুষের মন-মস্তিষ্কে তা সঠিক চিন্তাধারার উদয় হওয়া। উদারহরণস্বরূপ এক প্রকার সুস্থতা হলো মানুষের একথা বলা যে, আমি সুস্থ আছি, আরেক প্রকার সুস্থতা হলো পরবর্তীতেও মানুষের সুস্থ থাকা। অতএব 'তানভীর' হলো চিন্তা-ধারার সেই সুস্থতার নাম যার ফলে ভবিষ্যতে যে ধ্যান-ধারণাই মাথায় উদয় হয় তা সঠিক হওয়া। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার জন্য আলোকিত মন-মানসিকতা আবশ্যক। আর আধ্যাত্মিকতার জন্য তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থে, মন-মস্তিষ্কের প্রেক্ষাপটে 'তানভীর' শব্দের যে অর্থ রয়েছে হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে সেটিই তাক্বওয়ার অর্থ। মানুষ সচরাচর পুণ্য এবং তাক্বওয়াকে এক ও অভিন্ন জিনিস মনে করে। অথচ নেকী বা পুণ্য হলো, সেই সৎকর্ম যা আমরা ইতোমধ্যে করেছি বা করার ইচ্ছা রাখি। আর তাক্বওয়া হলো, ভবিষ্যতে মানুষের ভেতর যে আবেগ-অনুভূতিই সৃষ্টি হোক তা যেন নেক আর পূতঃপবিত্র হয়। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মন-মস্তিষ্কের সাথে চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং অভিনিবেশ ইত্যাদির সম্পর্ক আছে, এটিই 'তানভীর' বা এটিকে বলা হয় আলোকিত হওয়া। আর আবেগ-অনুভূতি বা আকর্ষণের সবসময় পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট থাকা আর একেই বলা হয় তাক্বওয়া। মানুষের চিন্তাধারা যদি আলোকিত হয় এবং হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে সে পাপের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকে। পাপের আক্রমন থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এমন মানুষ খোদার কৃপাভাজন হয়। যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, সাধারণ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন কোন প্রশ্নকারীকে জামাতের অন্যান্য আলেমের কাছে পাঠাতেন (উত্তরের জন্য)। কিন্তু অনেক প্রশ্ন এমনও আছে যা বাহ্যতঃ খুবই ছোট এবং তুচ্ছ, এক্ষেত্রে তিনি জামাতের আলেমদেরও সংশোধন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সফরে নামায কসর সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সফর কি আর কসর সংক্রান্ত নির্দেশ বা শিক্ষা কীভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত? সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার রীতি হলো, মানুষের নিজেকে অনেক বেশি সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়া উচিত নয়। মানুষ সচরাচর যা সফর হিসেবে জানে সেটি দু'তিন মাইলের সফর হলেও সেই ক্ষেত্রে সফর এবং কসর সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল তার মেনে চলা উচিত। **"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত"** (অর্থাৎ, মানুষের কর্মের ফলাফল তার অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে) অনেক সময় আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে (প্রাত বা সান্ধ্য) ভ্রমনের সময় দু'তিন মাইল দূরে চলে যাই, তখন কিন্তু কারো মাথায় একথা আসে না যে, আমরা সফরে রয়েছি। কিন্তু মানুষ যখন তার ব্যাগ গুছিয়ে সফরের উদ্দেশ্যে বের হয় বা তার জিনিসপত্র নিয়ে বের হয় তখন সে মুসাফির হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের ওপর নয়। তুমি যাকে সফর মনে কর সেটিই সফর।

অতএব এ বিষয়টি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যখন আপনি সফরের উদ্দেশ্যে বের হন সেটিই সফর। সম্প্রতি আমি এখানে (যুক্তরাজ্যে) একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য যাই, খুব সম্ভব লেস্টারের মসজিদ উদ্বোধনের জন্য যাই আর সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্বে আমি ইশার নামায

পুরো পড়িয়েছি। এতে অনেকের মাথায় প্রশ্ন জেগেছে যে, **নামায কসর পড়ানো হয়নি!** তখন আমার স্মৃতিপটে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তি ছিল যে, ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে সেটিই সফর, এটি যেহেতু সত্যিকার অর্থে সফর ছিল না আর আমার যেহেতু ফিরে আসার কথা ছিল তাই আমি নামায কসর করিনি। এছাড়া **"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত"**-কেও আমি সামনে রেখেছি। যদি এটি সামনে থাকে তাহলে মানুষ নিজেকে বেশি কাঠিন্যের মুখেও ঠেলে দেয় না আবার সীমাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাও সন্ধান করে না বরং তার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী মেনে চলা। এই বিষয়টিকে খোলাসা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"নিজেদের নিয়্যত এবং উদ্দেশ্য ভালোভাবে খতিয়ে দেখ। এমন সব সব ক্ষেত্রে তাক্বওয়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখ। যদি কোন ব্যক্তি দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাহিরে যায় বা এই উদ্দেশ্যে সফরে যায় তাহলে সেটি সফর নয় বরং সফর সেটি যা মানুষ বিশেষভাবে অবলম্বন করে আর কেবল এ উদ্দেশ্যেই ঘর পরিত্যাগ করে অধিকন্তু তা সফর হিসেবে বিদিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। দেখ! আমরা সচরাচর ভ্রমনের জন্য প্রতিদিন দুই দুই মাইল পর্যন্ত পাড়ি দেই, কিন্তু এটি সফর নয়। এমন সময় হৃদয়ের প্রশান্তি কোথায় তা দেখা উচিত। যদি কোন সংশয় ছাড়াই এটি অর্থাৎ হৃদয় ফতওয়া দেয় যে, এটি সফর তাহলে কসর কর। 'ইসতাফ্তে ক্বালবাকা' নিজের হৃদয়ের কাছে জিজ্ঞেস কর বা নিজ হৃদয়ের কাছে ফতওয়া চাও, এরপর নেককর্ম কর।"** পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"সহস্র সহস্র ফতওয়া থাকলেও মু'মিনের নেক অভিপ্রায় নিয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি সন্ধান করা পছন্দনীয় বা উন্নত একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব হৃদয়ের কাছে বা মনের কাছেও ফতওয়া চাওয়া উচিত।"** নিয়্যত বা অভিপ্রায় পবিত্র হওয়া উচিত আর একই সাথে হৃদয়ের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা উচিত।

কেউ প্রশ্ন করে যে, কোন ব্যক্তি কেন্দ্রে আসলে সে নামায কসর করবে কি না? এই প্রশ্ন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও করা হয়েছে আর আজও কেউ কেউ করে থাকে। অনেকের ধারণা হলো, কেন্দ্রে গেলে কসর করতে হয় না। মানুষ যখন কাদিয়ান বা রাবওয়া যেতো বা এখানে (লন্ডনের) এই কেন্দ্রেও কেউ কেউ আসে, তারা এই প্রশ্ন করে। তিনি (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি তিন দিনের জন্য এখানে আসে তার জন্য কসর করা বৈধ। আমার মতে যেই সফরে সফরের সংকল্প থাকে তা তিন চার ক্রোশের সফর হলেও সেক্ষেত্রে নামায কসর করা বৈধ। হ্যাঁ ইমাম যদি স্থানীয় হয়ে থাকেন তাহলে তার পেছনে পুরো নামায পড়তে হবে।"** অতএব যেখানেই যান, কেন্দ্র হোক বা যে স্থানই হোক না কেন যিনি নামায পড়াচ্ছেন তিনি যদি স্থানীয় হন তাহলে তিনি পুরো নামায পড়াবেন আর মুসাফিরও তার পিছনে পুরো নামায পড়বে। শাসক বা কর্মকর্তাদের ট্যুর বা সফর সফর নয়। সেসব কর্মকর্তা যারা ট্যুরে যায় তাদের সফর, সফর বলে গণ্য হবে না। তা কোন ব্যক্তির নিজের বাগানে ভ্রমন করার মত বিষয়। বিনা অকারণে বা অযথা সফরের কোন ধারণাই নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবীদের সংশোধন করতেন সে সম্পর্কে কাজী আমীর হোসেন সাহেব (রা.) বলেন, প্রথম দিকে আমার বিশ্বাস ছিল, সফরে সাধারণ অবস্থায় নামায কসর করা বৈধ নয়, শুধু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ফিতনার ভয়ে নামায

কসর করা বৈধ আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের সাথে এ বিষয়ে অনেক বিতর্কেও লিপ্ত হতাম। কাজী সাহেব বলেন, সে সময় গুরুদাসপুরে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি মামলা বা মোকদ্দমা চলছিল, একবার আমিও সেখানে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)ও ছিলেন। যোহরের নামাযের সময় হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাজী সাহেবকে বলেন, আপনি নামায পড়ান । তিনি বলেন, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই যে, আজ সুযোগ পেয়েছি, আমি আজ নামায কসর পড়বো না, পুরো নামায পড়ব বা পড়াব, তাহলে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আমি পুরো নামায পড়লে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই কিছু বলবেন। কাজী সাহেব বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত করে আল্লাহু আকবর বলার জন্য হাত উঠাই আর এই মানসে হাত উঠাই যে, নামায কসর করবো না,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পেছনে ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, **তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এক পা এগিয়ে সামনে আসেন এবং আমার কানের কাছে তাঁর পবিত্র মুখ রেখে বলেন, কাজী সাহেব দু'রাকাতই পড়াবেন আশা করি।** তিনি (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হুযূর! দু'রাকাতই পড়াব। কাজী সাহেব বলেন, তখন থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বা আমাদের মসলার সমাধান হয়ে যায় আর আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে নেই। অতএব এই ছিল সাহাবীদের রীতি। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৎক্ষণাৎ বিতর্ক পরিত্যাগ করতেন। কথা প্রসঙ্গে আমি এটিও বলতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদীও বর্ণনা করেছেন বা ফিকাহ্র বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন। এমন নয় যে, সব বিষয়েই সমাধানের জন্য তিনি আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি নিজেও বিভিন্ন সময়ে সমাধান দিতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন তা পাকিস্তানের নেযারাত ইশাআত বড় পরিশ্রম করে কয়েকজন আলেমের সাহায্য নিয়ে যাদের মাঝে জামেয়ার অধ্যাপক এবং ছাত্ররাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এগুলো সংকলন করেছে যা 'ফিকহুল মসীহ্' নামে এখানে ছাপা হয়েছে। এতে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলের সমাধান রয়েছে। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের এই বই ক্রয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করুন যারা এসব কথা বা এমন ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদী বা ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াদী এক জায়গায় সংকলন করেছেন। তারা এটিকে খুব সুন্দরভাবে সম্পাদন এবং সংকলন করেছেন। আমিও সময় পেলে বিভিন্ন সময় এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

জুমুআর নামাযের সাথে যদি আসরের নামায জমা করে পড়া হয় তবুও জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়া উচিত, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সফরে ছিলেন, তখন প্রশ্ন করা হয়, জুমুআর সময় কতক বন্ধুর মাঝে মতভেদ বা বিতর্ক দেখা দেয় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ফতওয়া হলো, যদি নামায জমা করা হয় তাহলে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আর মধ্যবর্তী সুন্নত মাফ হয়ে যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই

যে, যখন যোহর-আসর একত্রে পড়া হয় বা জমা করে পড়া হয় তখন পূর্ববর্তী এবং মধ্যবর্তী সুন্নত মাফ হয়ে যায় বা মাগরিব-ইশা যদি একত্রে পড়া হয় বা জমা করে পড়া হয় তাহলে মধ্যবর্তী এবং শেষের সুন্নত মাফ হয়ে যায়। কিন্তু মতভেদ যা দেখা দিয়েছে তাহলো একজন বন্ধু বলেন, তিনি আমার সাথে এক সফরে ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে ছিলেন, আমি জুমুআ এবং আসরের নামায জমা করিয়েছি বা একত্রে পড়েছি আর জুমুআর পূর্বের সুন্নতগুলোও পড়েছি, তো এই উভয় কথাই সঠিক। একথাও সঠিক যে, নামায জমা হওয়ার ক্ষেত্রে বা একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নত মাফ হয়ে যায় আর একথাও সঠিক যে, মহানবী (সা.) জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়তেন, আর আমিও সফরে থাকাকালীন তা পড়েছি এবং পড়ে থাকি। এর কারণ হলো, জুমুআর নামাযের পূর্বে যে নফল পড়া হয় তা যোহরের নামাযের পূর্বের সুন্নত থেকে পৃথক। মহানবী (সা.) জুমুআর সম্মানে এই সুন্নত প্রতিষ্ঠা করেছেন। সফরে জুমুআর নামায পড়াও বৈধ আর ছেড়ে দেয়াও বৈধ। অর্থাৎ মানুষ যদি সফরে থাকে তাহলে জুমুআ পড়তেও পারে আবার না পড়লেও চলে। কিন্তু না পড়ার অর্থ এই নয় যে, যোহরও পড়বে না, যোহর অবশ্যই পড়তে হবে। তিনি (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবার জুমুআ ছাড়তেও দেখেছি। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি মামলা বা মোকদ্দমা উপলক্ষে গুরুদাসপুর গিয়েছিলেন। সেখানে ব্যস্ততা ছিল, তিনি (আ.) বলেন, আজকে জুমুআ হবে না কেননা; আমরা সফরে রয়েছি। এক ব্যক্তি যিনি কৃত্রিমতামুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, আমি শুনেছি হুযূর বলছেন যে, জুমুআ হবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তখন গুরুদাসপুরেই ছিলেন, কিন্তু সেদিন কোন কাজে তিনি কাদিয়ান ফেরত চলে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি ধরে নেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) জুমুআ না পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, মৌলভী সাহেবের এখানে উপস্থিত না থাকার কারণে, কারণ জুমুআ তিনিই পড়াতেন। তাই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, হুযূর! আমিও জুমুআর নামায পড়াতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ বলেন, হ্যাঁ আপনি হয়তো পারবেন কিন্তু আমরা সফরে রয়েছি তাই যোহরের নামায পড়ছি। তিনি বলেন, হুযূর আমি খুব ভালোভাবে জুমুআর নামায পড়াতে পারি আর আমি বেশ কয়েকবার জুমুআ পড়িয়েছিও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দেখেন, এই ব্যক্তির জুমুআর নামায পড়ানোর সুগভীর আগ্রহ রয়েছে, তখন তিনি বলেন, আচ্ছা! আজকে তাহলে আমরা জুমুআ পড়ে নেই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবার জুমুআ ছেড়ে দিতেও দেখেছি। সফরে যখন জুমুআ পড়ার ক্ষেত্রে আমি নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়ি আর আমার মতামত হলো, তা পড়া উচিত। সচরাচর এটিই ফতওয়া কেননা; এটি সাধারণ সুন্নত থেকে ভিন্ন প্রকৃতির এবং জুমুআর সম্মানে তা পড়া হয়। অতএব যদি জুমুআর নামায পড়া হয় তাহলে জুমুআ এবং আসর একত্রে পড়ার ক্ষেত্রেও খুতবার পূ র্বে যেহেতু সুন্নত পড়ার রীতি রয়েছে তাই তা পড়া উচিত।

মানব জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দের মুহূর্তও এসে থাকে, সমষ্টিগতও আর দেশীয়ও। আনন্দের সময় আনন্দের বহিঃপ্রকাশও ঘটে কিন্তু অনেকেই এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে অঢেল খরচ করা হয় বা ধর্মের নামে বা অন্য কোন অজুহাতে আনন্দ প্রকাশ করাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ মনে করা হয়। ইসলাম এই উভয় মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি এ যুগে আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মধ্যমপন্থা শিখাতে এসেছেন, তিনি আমাদেরকে প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও পথের দিশা দিয়েছেন। ধর্মীয় বিষয়েও আর জাগতিক বিষয়েও। নামাযের কথাতো আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি; এখন এক বাহ্যিক বা জাগতিক আনন্দের মুহূর্তে কীভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত আর এক্ষেত্রে তিনি কী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেই কর্মপন্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমি উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোকসজ্জা কোন বিশেষ উপলক্ষে করা হয়ে থাকে। এই আলোকসজ্জার কথা বর্ণনা করার কারণ হলো, রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল,বা অন্যকোন উপলক্ষে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা নেয়া হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষেও আলোকসজ্জা করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে এমনটি করা প্রমাণিত। তিনি দু'বার রানী ভিক্টোরিয়া বা খুব সম্ভব এ্যাডওয়ার্ডের জুবিলী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করিয়েছেন বা হয়তো এই উভয় জুবিলী রানী ভিক্টোরিয়ারই ছিল। আমার ভালোভাবে মনে পড়ে উভয় উপলক্ষেই আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবে এমন বিষয় যেহেতু আকর্ষণীয় মনে হয় তাই আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, মসজিদে মোবারকের কিনারায় প্রদীপ জ্বালানো হয় আর তেল ফুরিয়ে যায়। সে যুগে এভাবে তেলের প্রদীপ জ্বালানোর রীতি ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.) কাউকে বলেন, আরো কিছু তেল এবং প্রদীপ নিয়ে আসা হোক। তিনি (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে, মসজিদে এবং মাদ্রাসায়ও প্রদীপ জ্বালানো হয়। মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবও এর স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই নিছক আলোকসজ্জার বিরোধিতার তো প্রশ্নই উঠে না। অনেকেই বলে, আলোকসজ্জা বেহুদা কাজ। তিনি (রা.) বলেন, একথা ঠিক নয়। তিনি (রা.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, হাকাম হিসেবে বা যুগের ন্যায় বিচারক হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী কোন কথাই বলতেন না আর তাঁর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জার প্রমাণ পাওয়া যায় আর এ সম্পর্কে স্বাক্ষ্যও রয়েছে এবং আল্ হাকাম পত্রিকায়ও এটি উল্লেখিত রয়েছে। তাই বিশেষ আলোকসজ্জা সম্পর্কে কোন বিতর্কের প্রয়োজন নেই যে, কেন করা হবে? কীভাবে করা হবে? আর কখন করা হবে? অপব্যয় হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন তা নিজের মাঝে এক প্রজ্ঞার দিক রাখে, কেননা মু'মিনের প্রতিটি কাজে এটি নিহিত থাকে। আলোকসজ্জা যখন ব্যাপক পরিসরে করা হয় এবং প্রত্যেক ঘরে আলোকসজ্জা আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয় আর এত বেশি ব্যয় করা হয় যে, এর সত্যিকার কোন

উপকারী দিক সামনে না আসে তা হলে তা অবৈধ। হ্যাঁ, দেশীও এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন সেখানে যদি এমনটি করা হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেভাবে হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বলেন, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মীর সাহেব এ সংক্রান্ত স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে মসজিদে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি (রা.) বলেন, মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে অতিরিক্ত আলোর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা মানুষ সেখানে পবিত্র কুরআন পাঠ করে বা অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ করে থাকে, তাই হযরত উমর (রা.) যদি মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে তার পিছনে একটা যুক্তি আছে বা হিকমত আছে, নতুবা আমরা দেখেছি, ইসলামে আনন্দ প্রকাশের ভাষা সেটিই অবলম্বন করা হয় যার মাধ্যমে মানব জাতির অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। ঈদের সময় কুরবানী করা হয় যেন গরীবরা মাংস খেতে পায়। ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরানার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা হয়। অতএব ইসলাম যেখানেই উদযাপনের নির্দেশ দিয়েছে সেখানে এ কথার ওপরও জোর দিয়েছে যে, এটি এমনভাবে উদযাপন করা উচিত যেন দেশ ও মানব জাতির সমধিক কল্যাণ সাধন হয় কিন্তু আলোকসজ্জার মাধ্যমে এমন কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে আলোকসজ্জা করিয়েছেন তার সাথে একটি রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। অনুরূপভাবে তিনি অনেক সময় আমাদেরকে বাজি বা পটকা কিনে দিতেন যেন বাচ্চাদের আনন্দের উপকরণ জোগাড় হয়। তিনি (আ.) বলতেন, গন্ধক(ধুপ) জ্বললে জীবানু মারা যায়। তাই শুধু বাচ্চাদের আনন্দিত করার জন্য নয় বরং আতশবাজীতে গন্ধক থাকে যা জ্বালানো হলে বায়ু পরিস্কার হয়, তাঁর এমনটি করার এটিও একটি কারণ ছিল। তিনি বেশ কয়েকবার আমাদেরকে পটকা এবং ফুলঝুড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েছেন। যদিও এটি এক ধরনের অপব্যয় কিন্তু এতে সাময়িক উপকারিতাও রয়েছে। এতে বড় ধরনের উপকারিতা না থাকলেও অন্ততঃপক্ষে বাচ্চারা আনন্দিত হত। বাচ্চাদের আবেগ-অনুভূতিকে চাপা দিলে যে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তা থেকে রক্ষা হত। কিন্তু তিনি পুরো জামাতকে আতশবাজি পোড়ানোর নির্দেশ দেন নি। একথা বলেন নি যে, তোমরা আতশবাজি পোড়াও। হ্যাঁ, শিশুরা কোন সময় তা করলে কোন ক্ষতি নেই। আর বায়ু পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে যদি তা করা হয় তাহলে উভয় স্বার্থসিদ্ধি হয়, শিশুরাও আনন্দিত হয় আর বায়ুও পরিস্কার হয়। বাচ্চারা যদি কিছুটা বিনোদনের সুযোগ পায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। তাদের আবেগ- অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে পিষ্ট করা উচিত নয়। শিশুদের মাঝে এই অনুভূতিও থাকা চাই যে, তাদের ক্রীড়া-কৌতুকের যে বয়স এই বয়সে ইসলাম তাদের বৈধ দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। যেমন আলোকসজ্জা এবং আতশবাজি ইত্যাদি যেখানে তাদের দেশের সামগ্রীক আনন্দের অংশীদার করে সেখানে এতে দেশের সাথে এক সম্পৃক্ততাও প্রকাশ পায় আর এভাবে শিশুদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা হয়। স্থান-কাল ভেদে ভারসাম্য বজায় রেখে বিনোদন করা বারণ নয় কিন্তু শৈশবেই বাচ্চাদের সামনে স্পষ্ট করা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষা এবং দেশীয় আইনের গন্ডিতে থেকেই আমরা সব কিছু করি এবং করব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর শৈশবের দু'টো ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার সব সময় মনে থাকে, আমি তখন এক ছোট বালক ছিলাম, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুলতান যান, তখন আমিও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম, আমার বয়স ছিল সাত বা আট বছর। এই সফরের কেবল দু'টো ঘটনা আমার মনে আছে। তিনি (রা.) বলেন, অবশ্য এমন কিছু ঘটনাও আমার মনে আছে যখন আমার বয়স কেবল দু'বছর ছিল বরং এক বন্ধু একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন আর তাও আমার মনে পড়ে যায় অথচ তখন আমার বয়স মাত্র এক বছর ছিল। তিনি (রা.) বলেন, শৈশবের বেশ কিছু ঘটনা আমার মনে আছে কিন্তু এই সফরের কেবল দু'টি ঘটনা আমার স্মৃতিপটে জাগ্রত রয়েছে। প্রথম কথা হলো, ফিরতি পথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে অবস্থান করেন, সে দিনগুলোতে সেখানে মোমের নির্মিত মূর্তি প্রদর্শিত হচ্ছিল, অর্থাৎ মোম দ্বারা মূর্তি বানানো হতো যার মাধ্যমে বিভিন্ন বাদশাহ্ এবং তাদের রাজ দরবারের সচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতো। যিনি ইংলিশ ওয়্যার হাউজের যা সেই যুগে বোম্বাই হাউজ হিসেবে পরিচিত ছিল এর মালিক ছিলেন শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবং এমন তথ্য বহুল বিষয় যাতে ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়, আর যেহেতু এটি শিক্ষণীয় বিষয় তাই আপনিও দেখার জন্য চলুন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন, আমি যেন গিয়ে এসব মূর্তি দেখে আসি। আমি যেহেতু তখন একজন বালক ছিলাম তাই আমি মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকি যেন আমাকে এই মূর্তি দেখানো হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পীড়াপীড়ির কারণে আমাকে সাথে নিয়ে সেখানে যান। যেখানে বিভিন্ন বাদশাহ্র জীবনের ঘটনাবলীর সচিত্র প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যাতে কতেকের জীবন, মৃত্যু এবং রোগব্যাধির চিত্রও অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, এই ঘটনা আমার স্মৃতিপটে অম্লান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিয়ে যান বা নিতে সম্মত হন এজন্য যে অনেকেই এর এমর্মে প্রশংসা করে যে এটি একটি শিক্ষণীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়, এটি দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কেবল বাচ্চার পীড়াপীড়ির কারণেই চলে যান নি। যদি তিনি মনে করতেন, এটি এমন একটি কাজ যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তাহলে বাচ্চা শত পীড়াপীড়ি করলেও তিনি যেতেন না। এটি যেহেতু শিক্ষণীয় বিষয় ছিল তাই তা দেখার জন্য বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যান।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দ্বিতীয় ঘটনা যা আমার মনে পড়ে তাহলো কেউ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লাহোরে নিমন্ত্রণ করে এবং তিনি তাতে অংশগ্রহণের জন্য যান। আমার যেন মনে হয় এটি নিমন্ত্রণ ছিল না বরং মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের কোন সন্তান অসুস্থ ছিল যাকে দেখার জন্য তিনি গিয়েছিলেন। যাহোক, শহর হয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) ফিরে আসছিলেন, তখন সুনেহ্রী মসজিদের সিঁড়ির কাছে মানুষের একটা বড় জটলা দেখি যারা গালি দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, খুব সম্ভব সে কোন মৌলভী ছিল, যেভাবে মৌলভীদের অভ্যাস হয়ে থাকে সে বেজায় কোন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

গাড়ী যখন পাশ দিয়ে যায় তখন ভীড় দেখে আমি ভাবলাম এটি হয়তো কোন মেলা হবে। আমি দৃশ্য দেখার জন্য গাড়ী থেকে মাথা বের করি, তখনকার সেই ঘটনা আজও আমি ভুলিনি। আমি দেখেছি এক ব্যক্তি যার হাত কাটা ছিল এবং তাতে হলুদ লাগিয়ে পট্টি বাধা ছিল, সে গভীর উত্তেজনার সাথে তার কাটা হাত দ্বিতীয় হাতের ওপর মেরে মেরে বলছিল, মির্যা পালিয়ে গেছে, মির্যা পালিয়ে গেছে।

এই ঘটনা আরেকটি বরাতে পূর্বেও আমি শুনিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, দেখ! এক ব্যক্তি আহত, তার হাতে পট্টি বাধা কিন্তু বিরোধিতার আতিশয্যে সে মনে করে, আমি আমার কাটা হাত দ্বারাই নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করব, নির্মূল করব, মিটিয়ে দেব বা আহমদীয়াতকে দাফন বা কবরস্ত করব। এটি কত ভয়াবহ শত্রুতা যা মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করে। মানুষ যেন কাদিয়ান না আসে আর আহমদীয়াত গ্রহণ না করে এর জন্য হেন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করেনি। আহমদীদের মাঝে অনেক মানুষ এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে বাটালা পর্যন্ত আসে কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকে ফেরত পাঠায়। তিনি (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, মৌলভী আব্দুল মাজেদ ভাগলপুরী সাহেবও এ কারণেই প্রথমদিকে আহমদীয়াত গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি বাটালায় এলে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে প্ররোচিত করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আর এটিই মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর নিত্যদিনের ব্যস্ততা ছিল। সে প্রত্যেক দিন রেলষ্টেশনে উপস্থিত হতো আর যেসব মানুষ কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে ট্রেন থেকে নামতো তাদেরকে বলতো, কাদিয়ান গিয়ে কি করবে? সেখানে গেলে ঈমান নষ্ট হবে। অনেকেই তাকে আলেম মনে করে ফিরে যেত। আর মনে করত, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন যা বলছে সত্যই হবে। এসব কিছুই মৌলভীদের বিরোধিতার ফলশ্রুতি ছিল, তারা জনসাধারণকে এতটাই বিভ্রান্ত করে যে, সেই হাত কাটা ব্যক্তিও নারাবাজি করছিল। এসব কিছু অর্থাৎ আলেমদের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই যে বিরোধিতা এটি তাদের অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ছিল। কিন্তু ধর্মের নামে তারা মানুষকে প্ররোচিত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছিল। অথচ যে কারণে বিরোধিতা করা হচ্ছিল বা যে কারণে আজও বিরোধিতা করা হয় এবং যে কথা বলে আলেমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মসীহ্ মওউদ (আ.) তো এসেছেনই সেই কাজ করার জন্য, সেই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা এবং মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুওয়তের যে সুমহান মর্যাদা রয়েছে তা পৃথিবীতে সুস্পষ্ট করার জন্য এবং প্রতিষ্ঠার করার জন্য। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন এবং নিষ্ঠাবান দাস ছিলেন। তিনি এসেছেন জগদ্বাসীকে একথা জানানোর জন্য যে, পৃথিবীর মুক্তি এখন এই শেষ রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে বা তাঁর কল্যাণেই সম্ভব। কিন্তু এই নামধারী আলেমদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এই রসূল প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাঁর কথা না মেনে তাঁর ওপর এই অপবাদ আরোপ করছে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করেন বা মহানবী (সা.) থেকে নিজের মর্যাদাকে মহান এবং বড় মনে করেন। অথচ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আচার-আচরণ এবং তাঁর শিক্ষার সাথে এসব কথার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তিনি (আ.) সব ধর্মাবলম্বীদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, এখন মুক্তির পথ কেবল একটিই আর তা হলো, ইসলাম গ্রহণ এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্ব বরণ।

যাহোক, এসব আলেম-ওলামার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জামাতের উন্নতি অব্যাহত ছিল। আর আজও এরা এমন অপচেষ্টা করছে এবং করবে কিন্তু ঐশী তকদীর হলো মহানবী (সা.) এর এই নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামাত উন্নতি করছে এবং করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন নিজেদের মাঝে সেই সত্যিকার পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান এবং প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত যেন আমরা স্থাপন করতে পারি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারাকে আলোকিত করার চেষ্টা করুন, আর হৃদয়কে তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ করুন।

আজও জুমুআর পর এক ভদ্র মহিলার গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাফিয রহমান সাহেবার জানাযা, যিনি সাহিঁওয়ালের সাবেক আমীর ড. আতাউর রহমান সাহেবের স্ত্রী। তিনি ২০১৬ সালের ১৫ই এপ্রিল ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিঞাঁ আযিমুল্লাহ্ সাহেবের পুত্রবধু এবং হযরত শেখ হোসেন বক্স সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। তার পিতা জনাব মালেক মোহাম্মদ খুরশীদ সাহেব রাবওয়ার প্রথম নির্মাণ কমিটির প্রাথমিক যুগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল সাহিঁওয়ালের লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর আস্থা রাখতেন, দোয়াগো, ইবাদতগুযার, গরীবদের লালন-পালনকারিনী, আর্থিক কুরবানী কুরবানীতে অগ্রগামী, খিলাফতের সাথে সুগভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। ধৈর্যশীলা এবং খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ একজন নারী ছিলেন। সাহিঁওয়ালে আল্লাহ্ তা'লার পথে যারা বন্দি হয়েছেন এবং যে দুর্ঘটনা ঘটে সেই সময় সেখানকার আমীর ছিলেন তার স্বামী, তাই অনেকেই সাক্ষাতের জন্য তার কাছে আসতো। তিনি তাদের আতিথেয়তা করতেন। তার স্বামী ডাক্তার আতাউর রহমান সাহেব প্রায় ৪০ বছর জামাতী দায়িত্ব পালন করা অব্যাহত রাখেন। তিনি খুবই দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সাথে তাকে সাহায্য করেছেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সুগভীর যত্ন নিতেন। সব সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত এমনভাবে করেছেন যে তাদের সবারই খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যত করেছেন। তিনি পাঁচজন পুত্র এবং তিনজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন এবং তার সব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জামাতের জন্য কল্যাণকর হবে আমি এ দোয়াই করি। (আমীন)

**কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।**